৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৮

টপিক: আধুনিক যুগ-১: যুগসন্ধিক্ষণ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

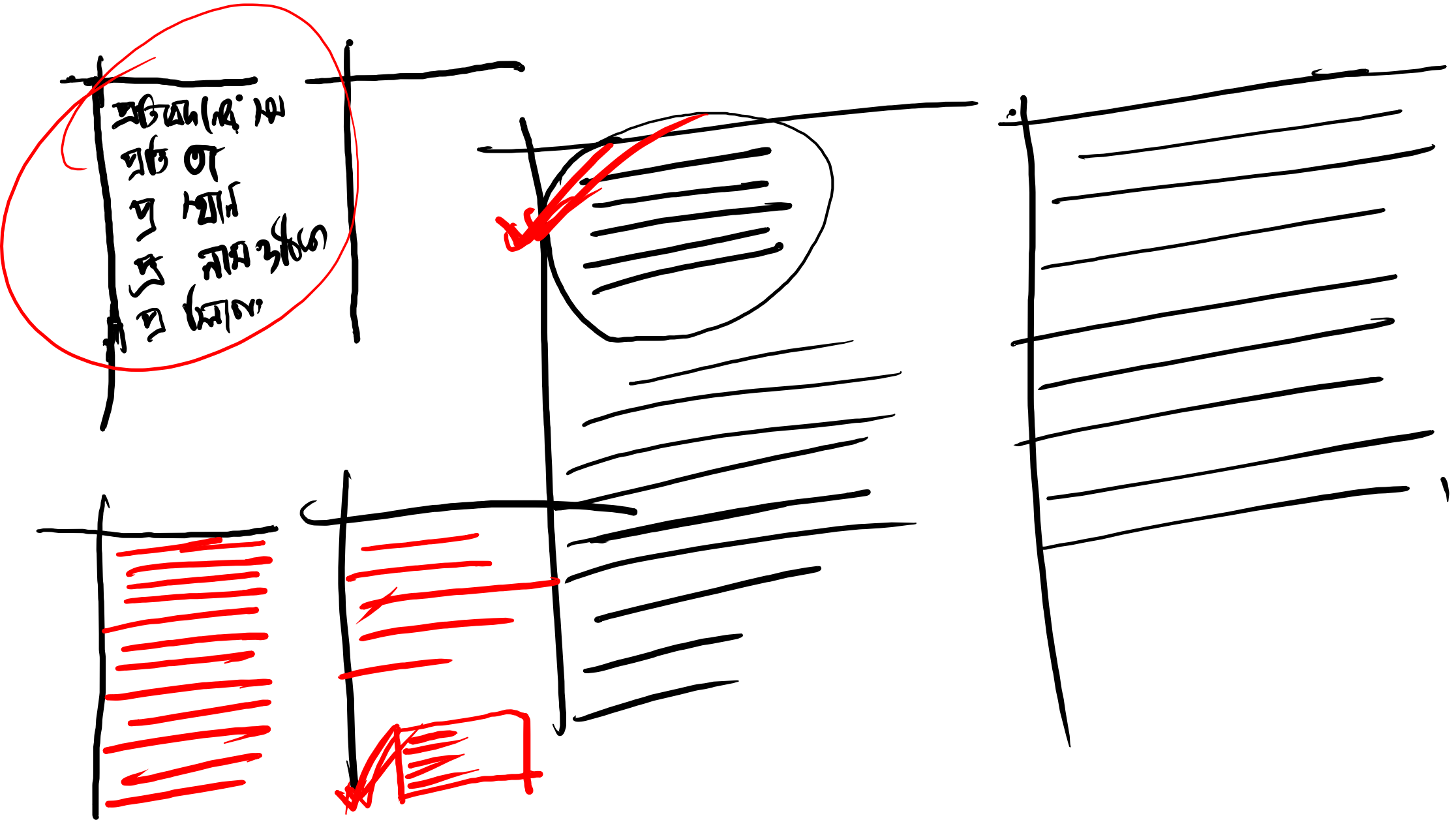

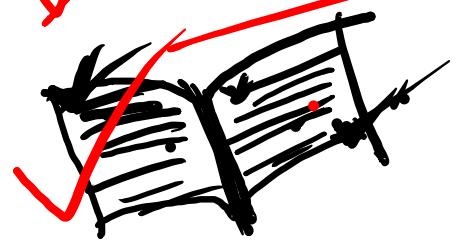

যুগসন্ধিক্ষণ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সাধারণভাবে যুগসন্ধিক্ষণ মানে দুই যুগের মিলন। যুগসন্ধিক্ষণ বলতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ কালপর্বকে বোঝায়। এটি মূলত দুই যুগের সন্ধি বা মিলনের সময় যখন সাহিত্যজগতে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ১৭৬০ সালে মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আধুনিক যুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। এর মাঝে প্রায় ১০০ বছরব্যাপী সাহিত্যজগতে চলেছিল বন্ধ্যাকাল, ফলে এই সময়টুকুকে অবক্ষয় যুগ বা যুগ সন্ধিক্ষণের যুগ বলা হয়। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যযুগ শেষ হওয়ার পরে এবং আধুনিক সাহিত্য তথা জীবনমুখী সাহিত্যধারা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ই বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে এ সময়ে তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায় না। তখন বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভবের কাল এবং সাহিত্যের যথার্থ বাহনের উপযোগিতা বাংলা গদ্যে অর্জিত হয়নি। আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার

- সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন চলে আসে। এ সময় মধ্যযুগের ধর্ম ভিত্তিক সাহিত্যের পাশাপাশি লৌকিক কাহিনিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সাহিত্যিক ঘরানার সূচনা ঘটে। এ সময়ের সাহিত্যিক ঘরানাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

১। কবিওয়ালা ও শায়েরদের উদ্ভব ২। পুঁথি সাহিত্যের বিকাশ ৩। টপ্পা গান ৪। পাঁচালি গান ৫। শাক্ত পদাবলি

প্রশ্ন: ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] [illegible]:
মূল্যায়ন

উত্তর:

[illegible]

ঈশ্বর: বিদ্যাসাগর

[illegible]

[illegible]

মাতা: [illegible]

পিতা: [illegible]

[illegible]

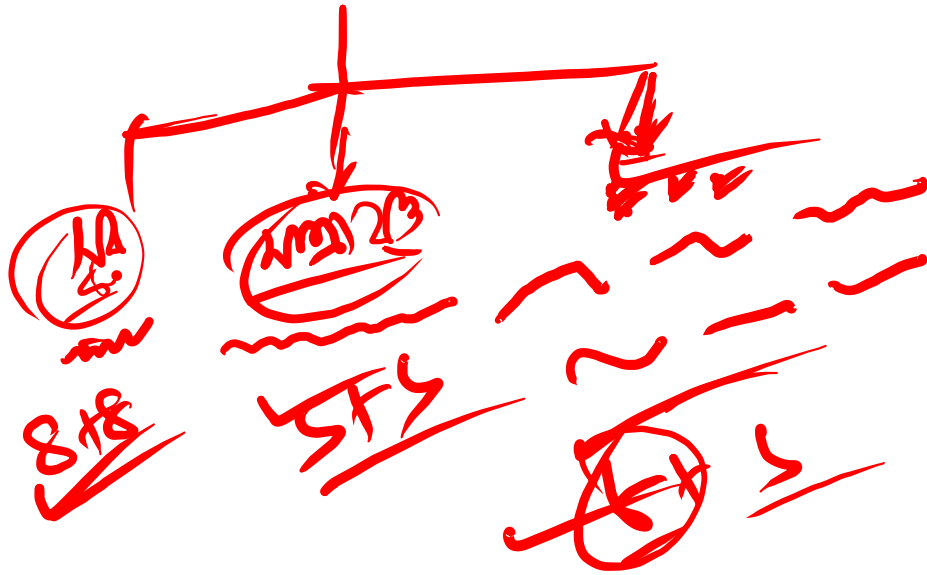

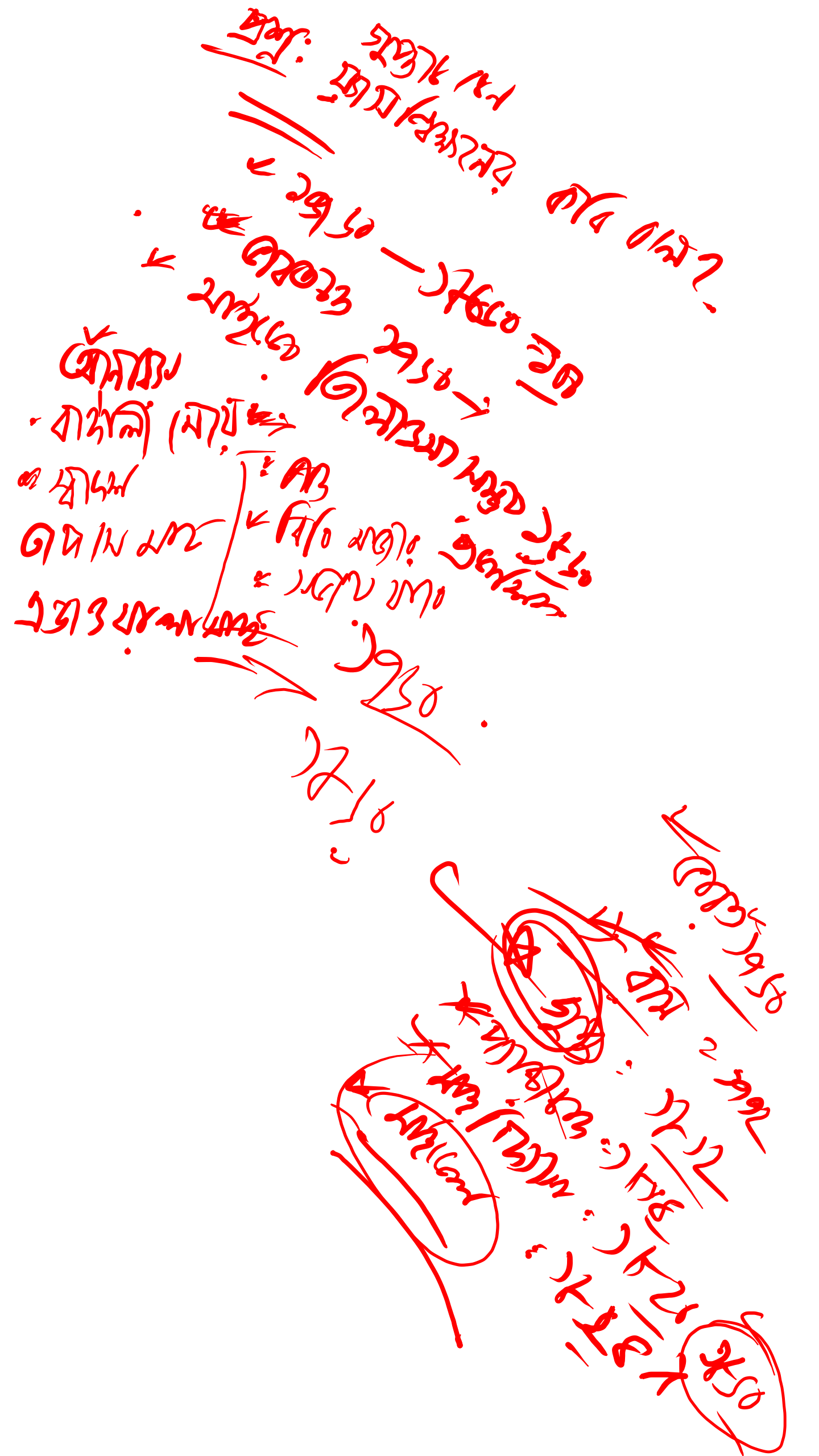

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানবিকতা, ব্যক্তিচেতনা, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, মৌলিকতা, মুক্তবুদ্ধি, নাগরিকতা, মুদ্রণযন্ত্র, আঙ্গিকের রুপান্তর ও মানুষের প্রাধান্যভিত্তিক রচনা। এর সাথে যোগ হয়েছে- রোমান্টিকতা, যান্ত্রিকতা, প্রগতিশীল চিন্তা ও নগরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থাপনা। আর সাহিত্য কালিক বাস্তবতা প্রভাবিত বলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক কালের সাহিত্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকটিত। গদ্য সাহিত্যকে এ যুগের প্রতিভূ বলা হয়। এ যুগে গদ্যনির্ভর সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের ফলে সাহিত্যে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সৃষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

গদ্য সাহিত্যের সূচনা

গদ্য হলো মানুষের কথ্য ভাষার লেখ্যরূপ। এর বিপরীত হলো পদ্য বা কাব্য। গদ্যের প্রাথমিক ব্যবহার চিঠিপত্র লেখায়, দলিল-দস্তাবেজ প্রণয়নে এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচনায়। বাংলা পদ্যের ইতিহাস শুরু হয়েছে চর্যাপদ থেকে; কিন্তু গদ্যের ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। ১৫৫৫ সালে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত ঢাকার ভূষণার জমিদার পুত্র দোম অ্যান্টনিও রচিত ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (পটভূমি) বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এছাড়া –

বাংলা কথ্য ভাষার আদিগ্রন্থ	মনোএল দা আসসুম্পসাঁওয়ের রোমান লিপিতে লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'
বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ	মিশন সমাচার (মথী রচিত)

আঠারো শতকে বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশ সূচিত হলেও মূলত সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে। এসময় প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন।

ছোটগল্পের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

১। ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে বৃহতের ইঙ্গিত থাকবে।

২। শুরু ও উপসংহার হবে নাটকীয়।

৩। বিষয়বস্তু সাধারণত স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে চলবে।

৪। বাহুল্য বর্জনের মাধ্যমে গল্পটি হয়ে উঠবে রসঘন।

৫। রূপক বা প্রতীকের মাধ্যমে অব্যক্ত কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত।

৬। গল্পসমাপ্তির পরেও পাঠকের মনের মধ্যে এর গুঞ্জণ চলতে থাকবে।

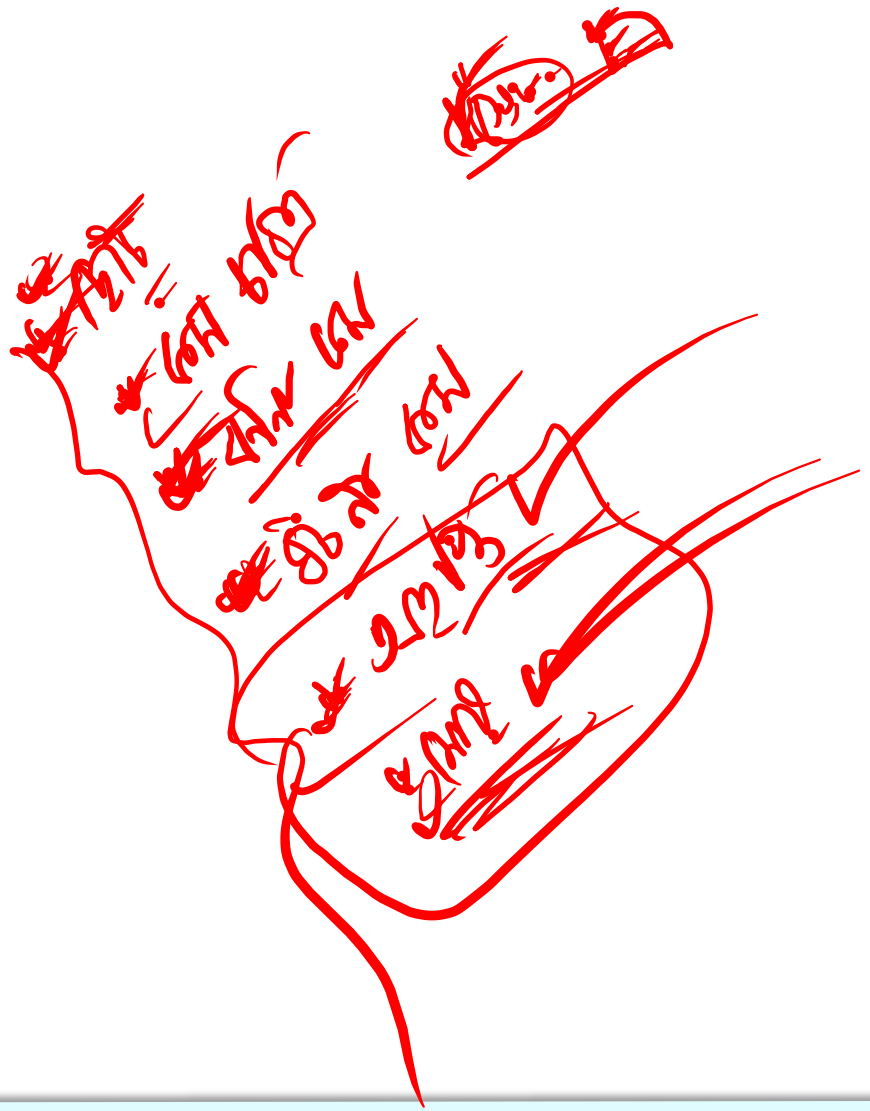

আধুনিক যুগ

মহাকাব্য

মহাকাব্য দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা বিশেষ। মহাকাব্য শ্রব্যকাব্যের একটি অংশবিশেষ। যে কাব্যে কোনো দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু নৃপতি বা রাজা-বাদশাহর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়, তা মহাকাব্য নামে পরিচিত। যিনি মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি মহাকবি নামে পরিচিতি পেয়ে থাকেন। সাধারণত বীর রসাত্মক আখ্যানকাব্যকে মহাকাব্য বলে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হলো মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে ৪ মে, ১৮০০ খ্রি. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলি। ইংরেজ অফিসারদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৮০১ খ্রি.। বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং একই সময় রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্যিক প্রভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির সময় কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর অবদান স্মরণীয়। ১৮০১-১৮১৫ সাল পর্যন্ত মোট ৮ জন লেখক ১৩টি বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা করেন। এই ৮ জনের অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরিকে বাংলা শেখান রামরাম বসু। এজন্য তাকে কেরি সাহেবের মুন্সি বলা হয়।

[illegible]: [illegible] [illegible]
[illegible]
✓ [illegible]
[illegible]
✓ [illegible] [illegible] [illegible]
✓ [illegible]
[illegible] [illegible]
✓ [illegible] [illegible]
✓ [illegible]
[illegible] [illegible]

ฐาน; ราช [illegible] เทพ ใช้ในคน;

[illegible]

[illegible]

[illegible] ๒ [illegible]

প্রশ্ন: মহাকাশের বৈশিষ্ট্য

১ অত্যন্ত বিস্তৃত: / ২ দূরত্ব বিশাল:

৩ নেযাকাশ বেশি: / শীতল:

৪ মুক্ত: তাপমাত্রা / অতিশীতল

৫ বায়ু:

৬ ভূ:

১৩ ৫

ধরা

(উত্তর)

আধুনিক যুগ

লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশকাল	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
উইলিয়াম কেরি	কথোপকথন	১৮০১	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	ইতিহাসমালা	১৮১২		হিতোপদেশ	১৮০৮
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১		রাজাবলি	১৮০৮
	লিপিমালা	১৮০২		প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	১৮০২	তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫	চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
			হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সংস্থাটির মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। সেখান থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সংগঠনের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। শিখা পত্রিকার স্লোগান– 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম লেখক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

কলকাতায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। ১৮২৮ সালে তাকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল হলো ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক। হিন্দু সমাজের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো এঁদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু প্রথা তথা ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়াস থেকে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা মদ্যপানে আনন্দবোধ করতেন। ইয়াং বেঙ্গলের উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন- কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালিপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। মাইকেল মধুসুদন দত্ত-ও ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

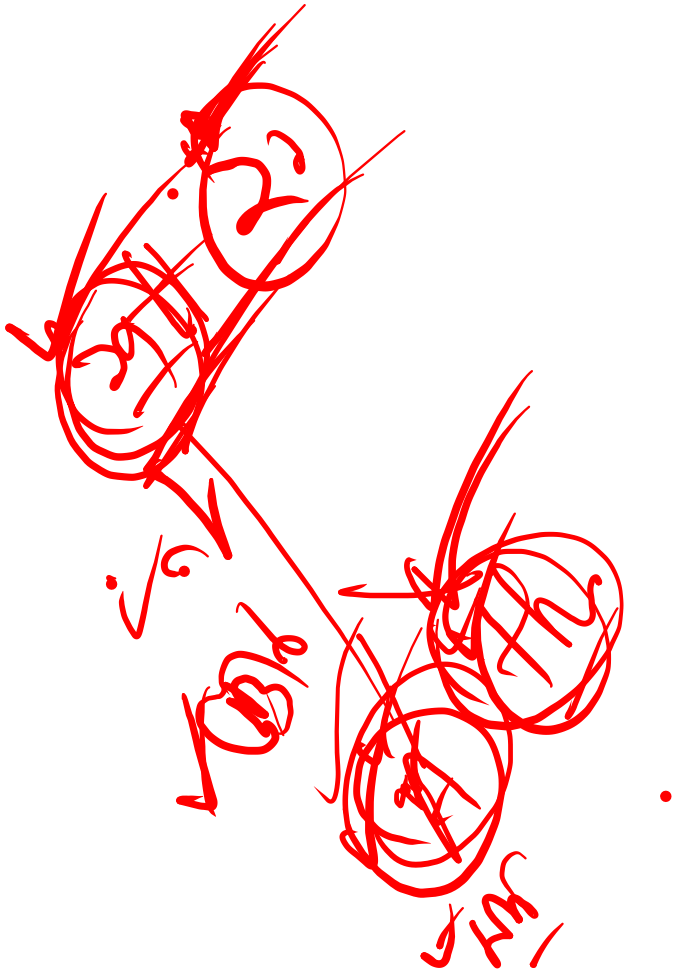

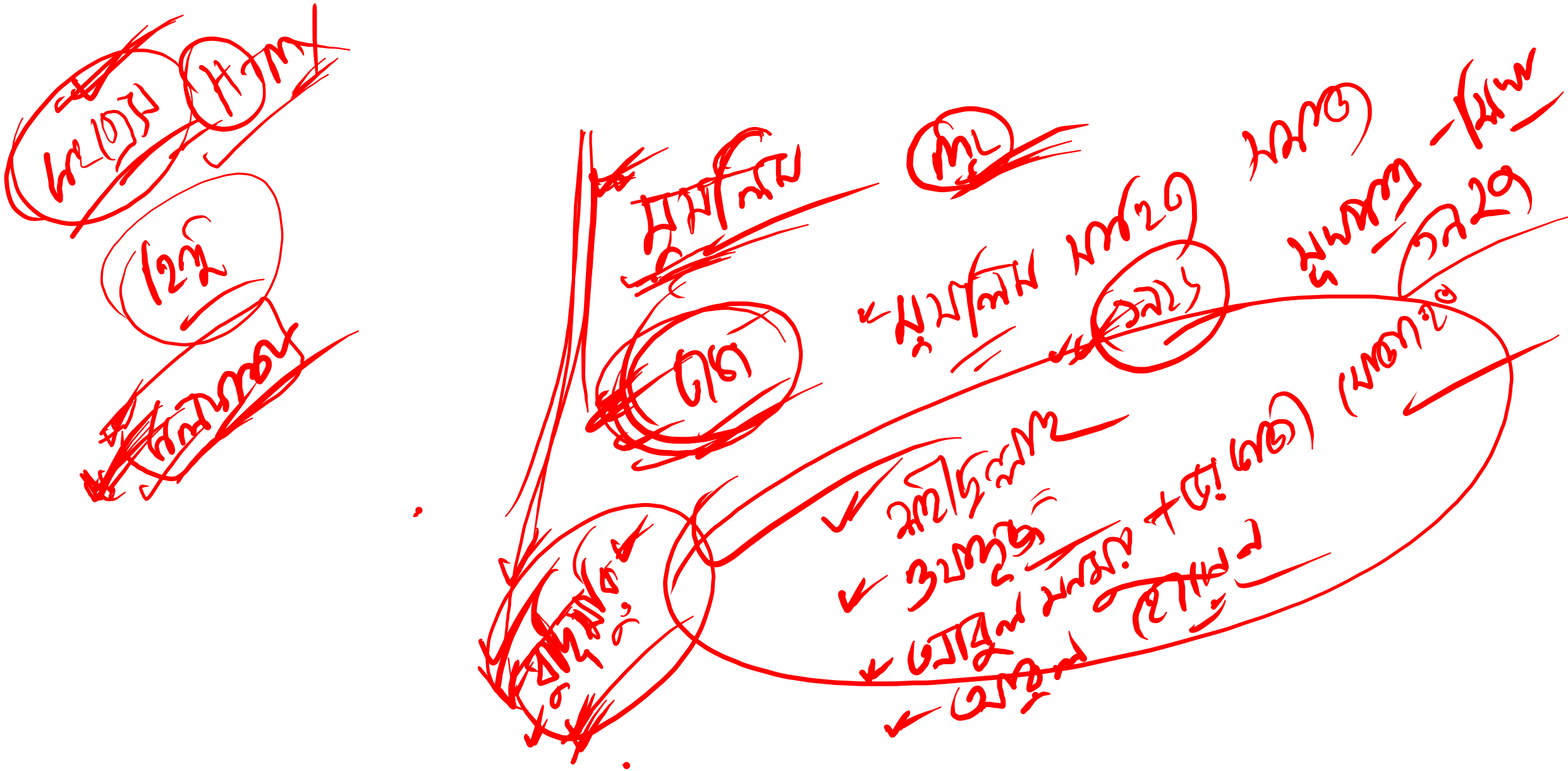

বাংলা একাডেমি

১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। বাংলা একডেমিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। 'The Bengali Academy Act-1957' এর মাধ্যমে একাডেমিটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' চালু করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে 'একাডেমী' বানানের পরিবর্তে 'একাডেমি' বানান চালু করা হয়।

আধুনিক যুগ

বাংলা একাডেমির প্রকাশিত পত্রিকা ৬ টি। যথা-

ক্রমিক নম্বর	পত্রিকার নাম	প্রকাশের ধরন	বিষয়
০১	বাংলা একাডেমি পত্রিকা	ত্রৈমাসিক	গবেষণামূলক
০২	উত্তরাধিকার	মাসিক	সৃজনশীল সাহিত্য
০৩	ধান শালিকের দেশ	ত্রৈমাসিক	কিশোর সাহিত্য
০৪	বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা	ষাণ্মাষিক	বিজ্ঞান বিষয়ক
০৫	বার্তা	মাসিক	মুখপত্র
০৬	বাংলা একাডেমি জার্নাল	ষাণ্মাষিক	-

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

যুগসন্ধিক্ষণের কবি

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থান মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগস্থলে। মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর এবং আধুনিক যুগের প্রথম প্রতিনিধি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ উভয়ের মাঝখানে আর্বিভাব ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। তিনি ছিলেন কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর লেখনিতে মধ্য এবং আধুনিক এই দুই যুগের বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে বলে তাঁকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। তিনি আধুনিক মানসিকতা যেমন পুরাপুরি ধারণ করতে পারেননি আবার একই সাথে মধ্যযুগের মানসিকতাও বর্জন করতে পারেননি।

তিনি কবিতায় নারী শিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গ, বিধবা বিবাহের বিরোধীতা, আধুনিক আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্রুপ করেছেন। এগুলো ছিল মধ্যযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। যেমন, 'বাঙ্গালির মেয়ে' কবিতায় বলেছেন,

(এরা) এ বি পড়ে বিবি সেজে
বিলিতি বোল কবেই কবে।
(এরা) পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে
সেজে গুজে সভায় যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

আবার তাঁর কবিতায় দেশপ্রেম, মাতৃভাষা প্রীতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যায়। যেমন, 'স্বদেশ' কবিতায় লিখেছেন,

'জাননা কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে।।

এভাবে দুই যুগের মিলনকারীরূপে তিনি সাহিত্যে অবদান রেখেছেন বলে তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

সাহিত্যকর্ম

বাংলা গদ্য অবলম্বনে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'আলালের ঘরের দুলাল' যা বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার জন্ম দেয়। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের আলোচনা করা হলো-

উপন্যাস		
▪ আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ▪ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯) ▪ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৮) ▪ ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮)	▪ রামারঞ্জিকা (১৮৬০) ▪ কৃষিপাঠ (১৮৬১) ▪ অভেদী (১৮৭১) ▪ বামাতোষিণী (১৮৮১)	▪ গীতাঙ্কুর (১৮৬১) ▪ যৎকিঞ্চিত (১৮৬৫) ▪ আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)

প্রশ্ন: দার্শনিক মতের তিনটি উদাহরণ দাও

(১)
(২)
(৩)

প্রশ্ন: আল্লাহর ঘর? কুরআন শরীফ বিষয়

প্রশ্ন: "অসম্ভব কেন"

- জাতীয়তা নেই
- তৈরি লক্ষ্য নেই
- সং চরিত্র নেই
- সাদৃশ্য প্রত্যাশার নেই
- ধর্ম ওয়াজ নেই

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

আলালের ঘরের দুলাল

প্যারীচাঁদ মিত্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস। এটি ১৮৫৮ সালে পুস্তিকা আকারে প্রকাশের পূর্বে তাঁরই সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' তে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ 'The Spoiled Child'. অনেকের মতে, এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। তবে একটি সার্থক উপন্যাসের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা ছিল এ উপন্যাসে সেই সব বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নকশা জাতীয় উপন্যাস বলেই অনেক সমালোচক বর্ণনা করেছেন।

এ উপন্যাসে লেখক নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন যা 'আলালী ভাষা' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে।

তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় নকশাধর্মী বর্ণনাতে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মতিলাল। সে বাবুরামের অতি আদরের সন্তান। অসৎ সঙ্গ এবং কুশিক্ষার কারণে মতিলালের অধঃপতন ঘটে। পরবর্তীতে তার বোধোদয় হয় এবং ধর্মের দিকে ঝুকে পড়ে। অন্যদিকে মতিলালের অনুজ রামলাল আদর্শ চরিত্র। মতিলালের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সুশৃঙ্খল জীবনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মোকাজান মিঞা। যিনি ঠকচাচা নামে পরিচিত। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র। এ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সমাজের ধূর্ত, সুবিধাভোগী, জোচ্চোর শ্রেণিকে তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলো হলো-- বাবুরাম, হলধর, গদাধর, ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর প্রমুখ।

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়

প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'। এই গ্রন্থটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া শ্রেণির ব্যক্তিদের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মতই সহজ সরল এর ভাষা, কিন্তু কিছু পরিমাণে সাধুভাষা ঘেঁষা বলে বিশুদ্ধতর। সামসময়িক কোন কোন লেখকের ওপর এই গ্রন্থ বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

আলালি ভাষা

প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে কলকাতা অঞ্চলের যে আঞ্চলিক ভাষা বা কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষার ব্যবহার করেছিলেন তাই মূলত 'আলালি ভাষা' নামে পরিচিত। আলালি ভাষাটি কলকাতার ভাগীরথী নদীর তীরের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। তিনি এই ভাষাকেই প্রথম লিখিত ভাষায়রূপ দান করে লিখে ফেলেন উপন্যাস। তিনি প্রথমবারের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত গদ্যরীতির নিয়ম ভেঙ্গে আলালি ভাষার মাধ্যমে প্রথম চলিত ভাষারীতির প্রয়োগ করেন। পরবর্তী সাহিত্যিকগণ তাঁর আলালি ভাষার অনুকরণে লেখালেখি করেন। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীসহ অনেকেই এ ভাষায় লিখেছেন বলে আলালি ভাষাকে আলালি রীতিও বলা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

সাহিত্যকর্ম

অনুবাদ গ্রন্থ	মৌলিক গ্রন্থ	শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্যবই
▪ বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) ▪ মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০) ▪ বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮) ▪ সীতার বনবাস (১৮৬০) ▪ জীবনচরিত (১৮৪৯) ▪ ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) ▪ বোধোদয় (১৮৫১) ▪ কথামালা (১৮৫৬) ▪ শকুন্তলা (১৮৫৪) ▪ চরিতাবলী (১৮৫৭)	▪ প্রভাবতী সম্ভাষণ ▪ নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮) ▪ জীবন-চরিত (১৮৯১; মরণোত্তর প্রকাশিত) ▪ রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬) ▪ শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪) ▪ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) ▪ বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৫৫) ▪ “অতি অল্প হইল” এবং “আবার অতি অল্প হইল” দুখানা পুস্তক (১৮৭৩) ▪ ব্রজবিলাস, যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য (১৮৮৪) ▪ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	▪ বর্ণপরিচয় (১ম, ২য় ভাগ ১৮৫৫) ▪ বোধোদয় (১৮৫১) ▪ ব্যাকরণ গ্রন্থ– ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম – ৪র্থ ভাগ) ▪ আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩) ▪ শব্দমঞ্জুরী (১৮৬৪) ▪ কথামালা (১৮৫৬) ▪ শ্লোকমঞ্জুরী ▪ ঋজুপাঠ ▪ বাংলা অভিধান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সংস্কার

১। বিধবা বিবাহ সংস্কার

সমাজসংস্কারের মুখ্যব্রত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তিনি একই শিরোনামে আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেন সমালোচকদের জবাব দেবার জন্য। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবরে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাস করার জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান।

বহুবিধ বিচার-বিশ্লেষণের পর ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইনের খসড়াটি গৃহীত হয়। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধায়নে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৭০ সালে বিদ্যাসাগর নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেন যে, শুধু কথায় নয় কাজেই তিনি বিধবা বিবাহ চান। 'বিধবা বিবাহ সিদ্ধ'- এমন আইন হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে গেছেন। ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেন। বাঙালি নারীজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে বিদ্যাসাগরকেই মান্য করা হয়।

সমাস প্রকরণ:

পূর্ব পদের প্রধান — অব্যয়ী

পর পদের প্রাধান্য → তৎপুরুষ কর্মধারয়

উভয় পদের — দ্বন্দ্ব

অন্য পদের — বহুব্রীহি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

নারীশিক্ষায় অবদান

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ। তিনি উপলব্ধি করেন যে, নারীজাতির উন্নতি না ঘটলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংকওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ভারতের প্রথম ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্ত্রী শিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ১৮৫৮ সালে মে মাসের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করত। পরবর্তীকালে তিনি সরকারের কাছে ধারাবাহিক তদবির করলে সরকার এই স্কুলগুলোর কিছু আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮টি। এরপর কলকাতায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত) এবং নিজের মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি অনুভব করেছিলেন প্রথাগত শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষাই হল যথাযথ শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার করেছিলেন সেগুলি হল- পাঠক্রম সংস্কার, গণিতে ইংরেজির ব্যবহার, দর্শনে পাশ্চাত্য লজিকের প্রবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন, বিরতি দিবসের পরিবর্তন প্রভৃতি। তিনি স্কুল বিভাগের সর্বস্তরের জন্য নতুন করে বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই লিখেছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তাঁর হাত ধরেই। পদ্যের মতো গদ্যেও তিনি যতি চিহ্ন ব্যবহার করে গদ্যকে ছন্দবদ্ধ করেছেন।

শিক্ষা সংস্কারে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম- বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), বর্ণপরিচয় (১ম, ২য় ভাগ ১৮৫৫), ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম – ৪র্থ ভাগ), আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩), শ্লোকমঞ্জুরী, ঋজুপাঠ।

বাল্যবিবাহ সংস্কার

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে জোর প্রচার শুরু করেন এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন পত্র সরকারের কাছে পেস করেন। প্রধানত বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকারি আইন প্রণয়ন করে কন্যার বিবাহের বয়স সর্বনিম্ন দশ বছর নির্ধারিত করা হয়।

ছোট জিনিস চকচক
বড় বড় সাথে
ঝড় জিনিস বাঁচে
মনি হতে ছাড়ো
ঐ ফিরিয় নহে
মিথ্যা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলার কারণঃ

বাংলা গদ্যের বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে তা পূর্ণতা পায়। উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসুর গদ্য রচনার প্রাথমিক প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু সেগুলোতে অপূর্ণতা ছিল। বাংলা গদ্যরীতি প্রচলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। বাংলা গদ্যে লালিত্য ও নমনীয়তা দান করে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিকরূপ নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলা, রূপময়, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনি প্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। তাঁরই বলিষ্ঠ প্রতিভার জাদুস্পর্শে বাংলা পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ অধিগ্রহণ করেছে। গদ্যে অস্থির গতি অতিবাহিত করে স্থিরতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। গদ্যচর্চার ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে গদ্যের সমস্ত জটিলতা দূরীভূত হয়েছে। গদ্যের সাবলীল রূপ দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার। তিনি ১৮৪৭ সালে বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন। তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিরাম বা যতিচিহ্নের প্রবর্তকও বলা হয়। তিনি প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। তাঁর পরিকল্পিত সাধু ভাষা আদর্শ সাধু ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। গদ্য সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও যতি চিহ্নের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী'বলে অভিহিত করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদানঃ

যার হাতের ছোঁয়ায় বাংলা গদ্য রূপময় হয়ে ওঠে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান নিম্নভাবে মূল্যায়ন করা যায়:

(ক) বাংলা গদ্যের লালিত্য ও নমনীয়তা দান করে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সাহিত্যিকরূপ নির্মাণ করেন।

(খ) বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস রীতি বিশুদ্ধভাবে নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন।

(গ) পূর্ববর্তী পদ্যে যতিস্থাপন ছিল বিরল, বিরাম চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার নির্দেশ করে তিনিই প্রথম বাংলা পদ্যের নিজস্ব ছন্দরূপটি আবিষ্কার করেন।

(ঘ) গদ্যে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে তিনি ভাষাকে সমৃদ্ধ, সরল ও আর্কষণীয় করে তোলেন।

(ঙ) তিনি প্রমিত সাধু রীতির প্রচলন করেন।

(চ) সুশৃঙ্খল শব্দবিন্যাস রীতি প্রচলন ও প্রয়োগ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	নাটক	সম্পাদিত পত্রিকা	প্রহসন
▪ মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ▪ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০) ▪ ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) ▪ বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) ▪ চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)	▪ শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ▪ পদ্মাবতী (১৮৬০) ▪ কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ▪ সুভদ্রা (নাট্যকাব্য) ▪ মায়াকানন (১৮৭৪)	▪ Spectator ▪ Hindo Patriot ▪ Athenaeum ▪ Hindu chronicle	▪ একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০) ▪ বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) **ইংরেজি কাব্য** ▪ The Captive Ladie (১৮৪৯)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মেঘনাদবধ কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ-শতকীয় বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একটি মহাকাব্য। কাব্যটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি ১৮৬১ সালে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি মোট নয়টি সর্গে বিভক্ত। মেঘনাদবধ কাব্য হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত, যদিও এর মধ্যে নানা বিদেশি মহাকাব্যের ছাপও সুস্পষ্ট। এটি মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এর প্রধান কাহিনি নেওয়া হয়েছে 'রামায়ণ' থেকে।

এখানে তিন দিন ও দুই রাতের একটি ঘটনা কাব্যিক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ঘটনাটি রামায়ণ থেকে অনুকরণকৃত। রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করেছে রাবণ। সীতাকে উদ্ধারের জন্যে রাম তার ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধে রাবণের সন্তান বীরবাহু এবং কুম্ভকর্ণ মারা গেছে। রাবণের স্ত্রী মন্দোদারী হাহাকার করছে। রাবণের আরেক সন্তান মেঘনাদ তার স্ত্রী প্রমীলাকে নিয়ে উদ্যানে বিলাসিতায় মত্ত ছিল। দেশাত্মবোধের কারণে সে তার আরাম ত্যাগ করে যুদ্ধে এসেছে। কিন্তু নিজের চাচা বিভীষণের চক্রান্তে অগ্নিদেবের মন্দিরে নিরস্ত্রভাবে লক্ষণের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুতে স্ত্রী প্রমীলা চিতারোহণ করেছে। মাইকেল নয়টি সর্গ বা অধ্যায়ে তার এ কাব্যটি রচনা করেন। প্রথম সর্গ অভিষেক, শেষ সর্গ সয়ংস্ক্রিয়া।

মূলত ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রের উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন রচনা করেন এই স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' শুধু একটি মহাকাব্যই নয়-এটি একটি দেশপ্রেমের প্রতীক, একটি ধর্মীয় বিরোধ। সত্য-মিথ্যার মাঝে বিদ্রোহী এ এক অমর মহাকাব্য।

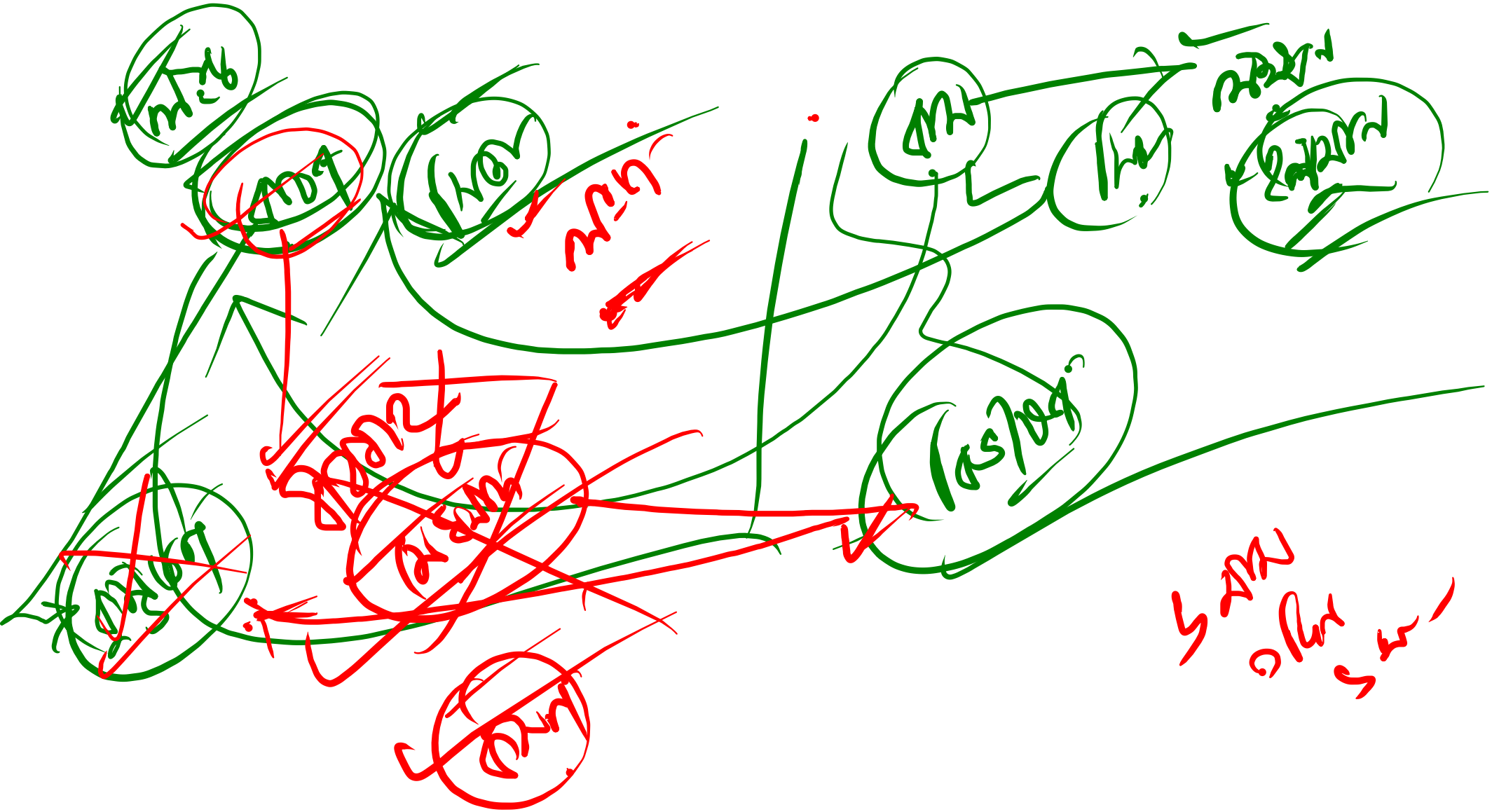

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)

'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। এই কাব্যে ১১জন নারীর ১১টি পত্র আছে। চরিত্র – দ্রৌপদী, জাহ্নবী, শূর্পনখা, রুক্মিণী, তারা, ভানুমতী, জনা, কৈকেয়ী, উর্বশী, শকুন্তলা প্রমুখ। দত্তকুলোদ্ভব কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরাঙ্গনা'- ইতালীয় কবি ওভিদের Heroides কাব্যের আদর্শানুসারে লিখিত পত্রকাব্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কবিতাগুলোকে Dramatic monologue জাতীয় কবিতা বলা যায়। এ কাব্যে কবি সরল ও আবেগময় ভাষায় নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় তাঁর লিরিক ক্ষমতাটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। মধুসূদন এগারটি পত্র পূর্ণ করেছিলেন। আরও কয়েকটির সূত্রপাত করলেও তার পক্ষে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ওভিদের কাব্যের নায়িকারা তাদের পতি বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে প্রধানত প্রেম-উদ্বোধিত চিত্তে পত্ররচনা করেছে। মধুসূদন এদেশের পৌরাণিক নারীচরিত্র উপজীব্য করে পত্ররচনা করেছেন। তবে কবি সেসব চরিত্র নিজের আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন। পত্রগুলোর কোন নারী নিষিদ্ধপ্রেমে উন্মাদিনী, কেউ প্রিয়সঙ্গলাভের জন্য কামাতুরা, কেউবা দুর্বল ভীরু স্বামীর প্রতি তীব্র বাক্যবাণবর্ষণে অকৃপণা। বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্রগুলোতে কামনার রক্তরাগ এবং চরিত্রের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্রগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কোথাও নায়িকার প্রেমানুভূতির বেদনাকাতর রূপটি ফুটে উঠেছে। যেমন 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে বনবাসিনী শকুন্তলার আবেদন :

কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব, সেবিবে
পা দু খানি-দাসীভাবে, এই লোভ মনে,
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দের দিক থেকে চরম সার্থকতা লাভ করেছেন। এমন কি 'মেঘনাদবধ কাব্যের' ছন্দ থেকেও এতে অধিক কৃতিত্ব বিদ্যমান।

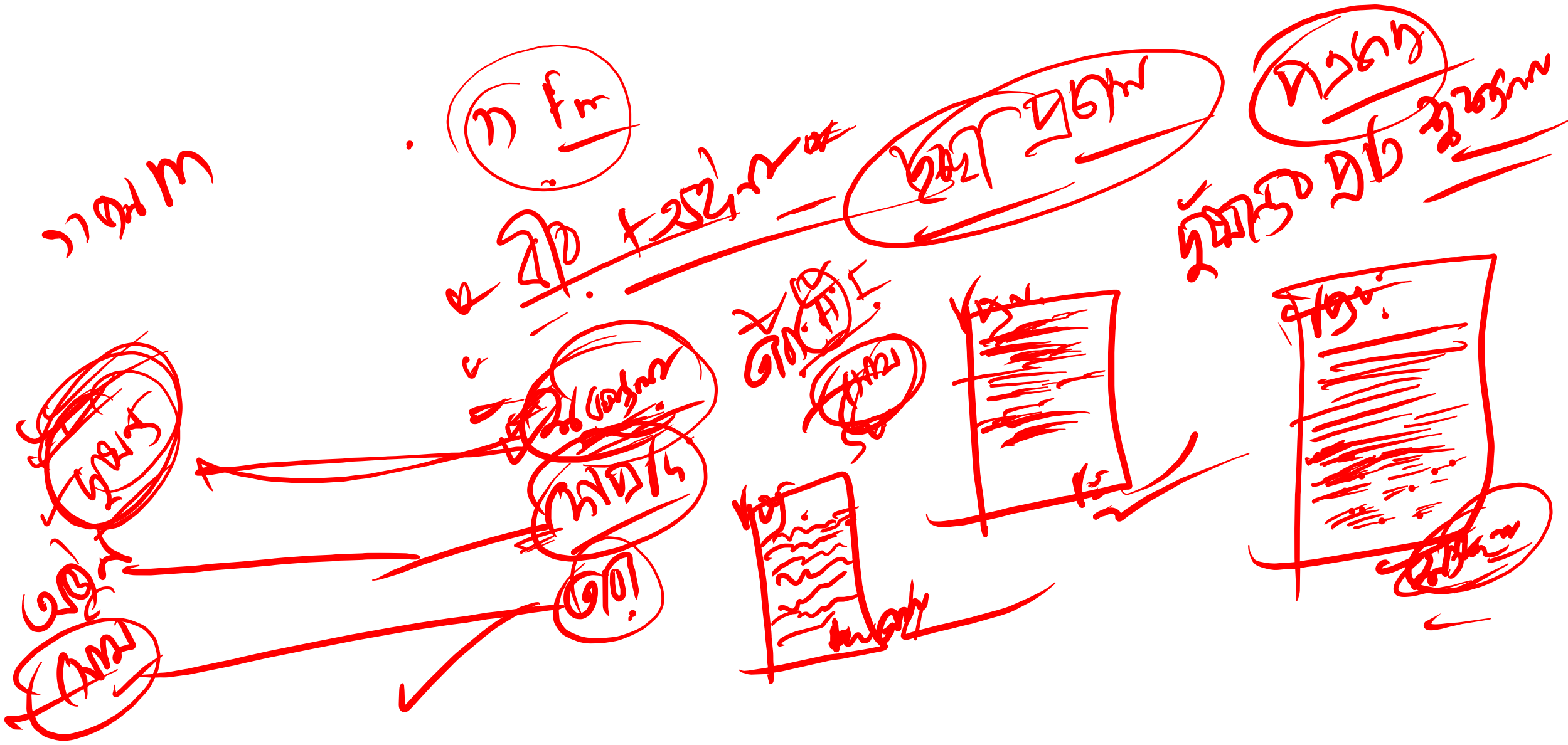

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে সনেট জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে মধুসূদন বাংলা কাব্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেছেন। এখানে সংকলিত সনেটের সংখ্যা ১০২টি। কবিতাগুলো প্রবাসে রচিত। কয়েকটি কবিতায় পেত্রার্কের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করা হলেও বাকী গুলোতে সেক্সপিয়ারের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে। বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, আশা প্রভৃতি বিখ্যাত সনেট এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবির স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষাপ্রীতি গভীর মমতায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন বঙ্গভাষা কবিতায় কবি বলেছেন,

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি।
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচারি
কাটাইনু বহুদিন সুক পরিহরি।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

একেই কি বলে সভ্যতা?

‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রহসনে সভ্যতার নামে উঠতি বয়সী তরুণদের সুরা পানসহ নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র – নববাবু এবং অন্যান্য চরিত্র– চৈতন্য, বালাই, কালীনাথ, নবকুমার, বাবাজী, নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং কর্তা মশায়।

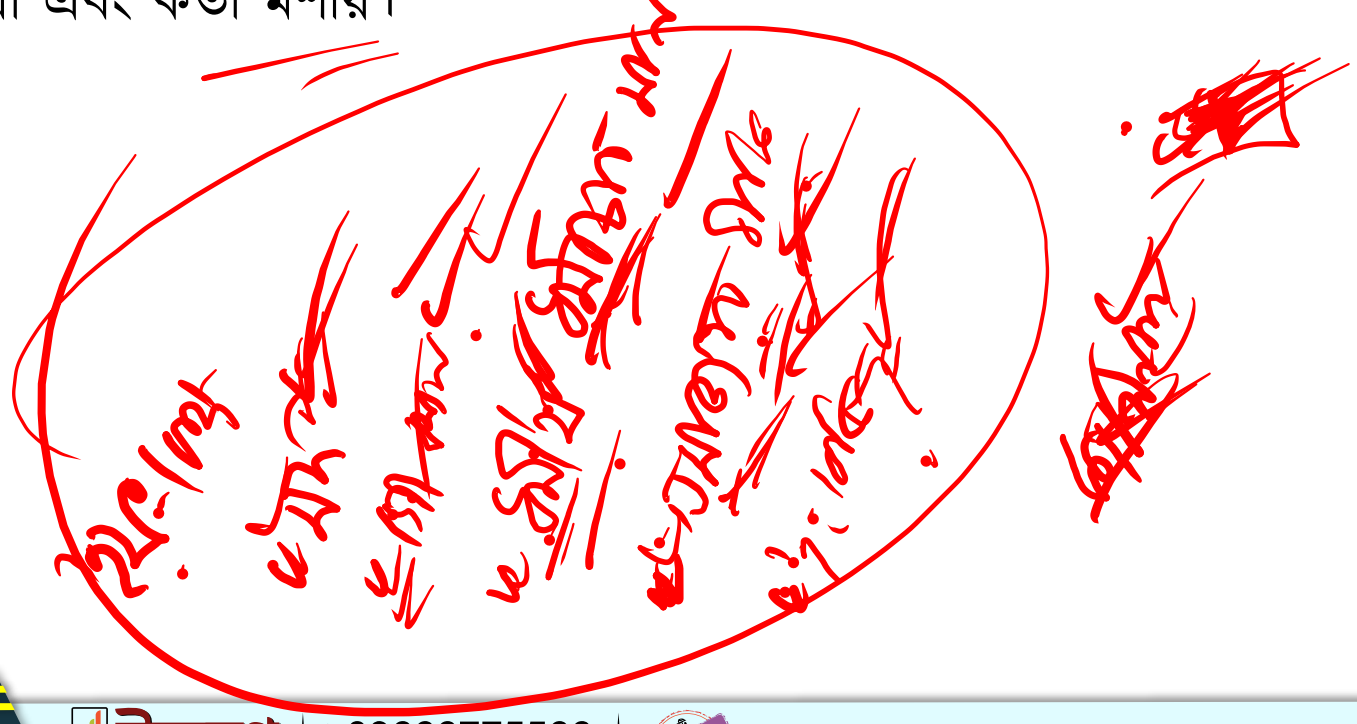

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

সাহিত্যকর্ম

নাটক	প্রহসন	গল্প	কাব্যগ্রন্থ
▪ নীলদর্পণ (১৮৬০) ▪ নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) ▪ লীলাবতী (১৮৬৭) ▪ কমলে কামিনী (১৮৭৩)	▪ সধবার একাদশী (১৮৬৬) ▪ বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ▪ জামাই বারিক (১৮৭২)	▪ যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (১৮৭২) ▪ পোড়া মহেশ্বর (১৮৭২)	▪ সুরধুনী কাব্য (প্রথম ভাগ –১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ– ১৮৭৬) ▪ দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

নীল দর্পণ

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'নীল দর্পণ'। এটি একটি সামাজিক নাটক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে। নাটকটি তিনি নীলকর সাহেবদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হলো বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার দুর্বিষহ নির্যাতনের কাহিনি। কিভাবে কৃষক গোলকমাধবের পরিবার নীলকরদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল এবং সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হল, তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। তোরাপ চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র; বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুব কমই আছে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। এটিতে কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর অঞ্চলের নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

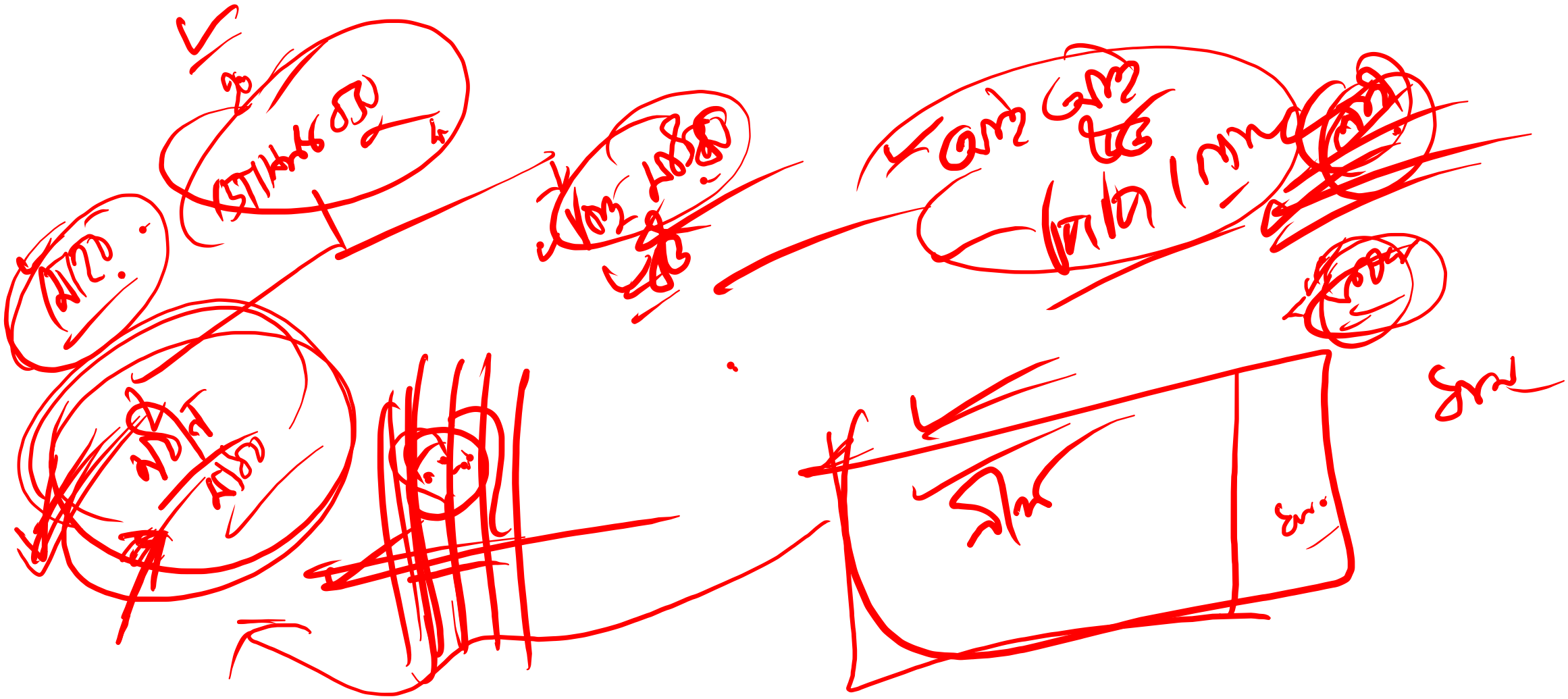

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

'নীল দর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার 'ইন্ডিগো কমিশন' বা 'নীল কমিশন' বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই নাটকের সঙ্গে হ্যারিয়েট স্টো-এর 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। মনে করা হয়ে থাকে, 'নীল দর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'Nil Darpan, or The Indigo Planting Mirror' নামে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বইটির প্রকাশক জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষজনের জীবনকথা এমনই সার্থক ও গভীরভাবে 'নীল দর্পণ' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে যে অনেকেই এই নাটককে বাংলার প্রথম গণনাটক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেদিক থেকে এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক নাটক।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

সধবার একাদশী

বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি আদি ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'সধবার একাদশী'। এটি একটি নাতিদীর্ঘ নাটক যা কি-না প্রহসন হিসেবে পরিগণিত হয়। এতে তিনটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে ২টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি এবং তৃতীয় অঙ্কে ৩টি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। নাটকটির চরিত্রসমূহ – নিমচাঁদ, অটল বিহারী (কেন্দ্রীয় চরিত্র), জীবনচন্দ্র। ১৮৬৮ সালে এটি প্রথম কলকাতার বাগবাজার 'অ্যামেচার থিয়েটার' দলের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।

'সধবার একাদশী' নাটকের মাধ্যমে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি বর্গের চাল-চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের কুফল ফুটিয়ে তোলা এ নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজের বেশ্যাবৃত্তির বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপান এবং বেশ্যার কারণে সামসময়িক সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নৈতিক অধঃপতন দেখা গিয়েছিল তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। উঠতি ধনী ব্যক্তিরা অর্থ ও বিত্তের জোরে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে যে অনাসৃষ্টি করে তারই একটি বিশ্বস্ত রূপ এই 'সধবার একাদশী'।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে 'সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক বেনামিতে মুদ্রিত 'নীলদর্পণ'। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশের কৃষক জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। নীলকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে রচিত হলেও এর মধ্যে গ্রাম্যসমাজের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা তৎকালীন নাট্যসাহিত্যে ছিল একান্তই অভিনব। নাটকটির মধ্যে এ দেশের শাসক ও শাসিতজনের সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের অবস্থা, সভ্য মানুষের মধ্যে বর্বরতার পরিচয় ইত্যাদি সামাজিক দিক সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল। মূলত নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন এই নাটকে। নাটকটির চরিত্র চিত্রায়ণে দেখা যায় দু একটি চরিত্র ছাড়া প্রায় সব চরিত্র ব্যর্থ। সংলাপের কৃত্রিমতায় ও পুঁথিগত ভাবের আড়ষ্টতায় স্বাভাবিক মানুষের মত হয় নি। তবে চাষাদের সরল উক্তির উপরোক্ত কৌতুকরস ও তারুণ্য মনকে নাড়া দেয়। আবার উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির ট্র্যাজেডিকে ক্ষুণ্ন করেছে। গঠনগত এসব ত্রুটি সত্ত্বেও এ নাটকের সামাজিক মূল্য যথেষ্ট গুরুত্ববহ। তাই 'নীলদর্পণ' নাটকটির সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ – ১৮৯৪)

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
▪ স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮)	▪ নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০)	▪ সারদামঙ্গল (১৮৭৯)	▪ বাউল বিংশতি (১৮৮৭)
▪ সঙ্গীত শতক (১৮৬২)	▪ বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০)	▪ মায়াদেবী (১৮৮২)	▪ সাধের আসন (১৮৮৯)
▪ বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)	▪ প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০)	▪ ধূমকেতু (১৮৮২)	▪ গোধূলি (১৮৯৯)

গীতিকবিতা

যে শ্রেণির কবিতায় কবি ব্যক্তিগত বা আপন হৃদয়ের অনুভূতি নিজের একান্ত কামনা, বাসনা ও আনন্দ বেদনা প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগ কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাব মূর্তিতে প্রকাশ করে সেই শ্রেণির কবিতাকে গীতিকবিতা বলে।
রবীন্দ্রনাথের মতে, "গীতি কবিতায় একটি মাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলমল করিয়া ওঠে।" গীতি কবিতা মন্ময় কবিতার অন্তর্গত।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ – ১৮৯৪)

গীতি কবিতায় বিহারীলালের অবদান:

আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত ঈশ্বরগুপ্তের হাতে। কিন্তু তাঁর হাতে গীতিকবিতা সফল রূপ পায় নি। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দুটোতেও গীতিকবিতার লক্ষণ ফুটে উঠে। তারপর বাংলা কবিতার আকাশে ভোরের পাখি নামে খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তিনি বাংলা গীতিকাব্য ধারায় সতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই আধুনিক গীতিকবিতার জনক এবং সচেতন গীতিকবি। তাঁর 'সংগীত শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিণী', 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি সার্থক গীতিকাব্য। সফল গীতি কবিতার যে ধারা বিহারীলালের হাতে সূচনা হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। বিহারীলালের গীতি কবিতা পাঠককে মন্ময় করে রাখে। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কবি বলেছেন,

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালা ফালা,
উহ্! কী জলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস		প্রবন্ধগ্রন্থ	
✓ Rajmohan'sWife (১৮৬৪)	✓ চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)	✓ লোকরহস্য (১৮৭৪)	✓ সাম্য (১৮৭৯)
✓ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)	✓ রজনী (১৮৭৭)	✓ মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৭৪)	✓ কৃষ্ণচরিত (১৮৮৬)
✓ কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)	✓ কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)	✓ কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)	✓ বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭)
✓ মৃণালিনী (১৮৬৯)	✓ আনন্দমঠ (১৮৮২)	✓ বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫)	✓ ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮)
✓ ইন্দিরা (১৮৭৩)	✓ রাজসিংহ (১৮৮২)	✓ বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬)	✓ শ্রীমদ্ভগবদগীতা
✓ বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)	✓ দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)	**কাব্যগ্রন্থ**	
✓ যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)	✓ সীতারাম (১৮৮৭)	✓ 'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬)	
✓ রাধারাণী (১৮৭৫)			

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

দুর্গেশনন্দিনী

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। উপন্যাসটি মূলত রচিত হয় ১৮৬২ - ১৮৬৩ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র- জগৎসিংহ, আয়েশা, তিলোত্তমা ও বিমলা ইত্যাদি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার মালিকানা নিয়ে পাঠান ও মোঘল সংঘর্ষের পটভূমিতে রচিত হয় এই উপন্যাস। দিল্লিশ্বরের প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহর পুত্র জগৎসিংহ বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণ যাত্রাকালে ঝড়ের কবলে পড়ে এবং শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় নিলে ঘটনাচক্রে মান্দারণ দুর্গাধিপতি জয়ধর সিংহের পুত্র বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী বিমলা ও তাঁর কন্যা তিলোত্তমার সাথে সাক্ষাত হয়। অতঃপর সাক্ষাতকালে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ কর্তৃক মান্দারণ দুর্গ অধিকার করা হলে বিমলা, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা তার কাছে বন্দি হয়। ওসমান খাঁ তাঁর প্রহসনমূলক বিচারে বীরেন্দ্র সিংহকে হত্যা করে। বীরেন্দ্রের স্ত্রী বিমলা পতিহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ পাঠান নবাব কতলু খাঁ কে হত্যা করে। পাঠানেরা কুমার জগৎসিংহের মাধ্যমে অম্বররাজ মানসিংহের সাথে সন্ধি করেন। অপর দিকে কতলু খাঁর কন্যা আয়েশা জগৎসিংহের প্রেমে পড়েন কিন্তু আয়েশা প্রণয়ী ওসমান এ কথা জানতে পারলে জগৎ সিংহের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পরিশেষে, মান্দারণ পুনরায় স্বাধীন হলে অম্বররাজ মানসিংহের মাধ্যমে বিমলার হাতে রাজ্যপাঠ হয় এবং জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলন ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

কমলাকান্তের দপ্তর

কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি ব্যক্তিধর্মী প্রবন্ধ-সংকলন। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা। এর প্রবন্ধগুলি প্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক ডিকুইনসির 'Confession of an English Opium Eater' এর অনুসরণে এটি লেখা। গ্রন্থটি তিনটি অংশের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জবানবন্দি- এ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এক চরিত্রের জবানিতে প্রবন্ধগুলি রচিত। কমলাকান্ত আফিম খেলেই দিব্যদৃষ্টি ফিরে পায় এবং সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা, দেশপ্রেম, দার্শনিকতায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠে। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্তের অনুসঙ্গী চরিত্র। এ গ্রন্থটিতে হাসির সাথে করুণের, অদ্ভুতের সাথে সত্যের, সরলতার সাথে মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সাথে তত্ত্ববোধের, শ্লেষের সাথে উদারতার সমন্বয় ঘটেছে। অনেকেই ধরে নেন যে, কমলাকান্তের আড়ালেই বঙ্কিম নিজে এর প্রতিনিধিত্ব করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

আনন্দমঠ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রচিত হয়। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র – ভবানন্দ, কল্যাণী, মহেন্দ্র সিংহ।

উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতি ও ধর্মপ্রীতি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। স্বদেশ বলতে তিনি বঙ্গভূমিকে এবং ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকে বুঝিয়েছেন। উল্লেখ্য এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এর কাহিনী কল্পিত কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। মন্বন্তরের বর্ণনা নিখুঁত এবং সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আখ্যান বাস্তব। উপমহাদেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই উপন্যাসের অবদান অসামান্য। এই গ্রন্থে তিনি 'বন্দে মাতরাম' গানের ব্যবহার করেছেন।এই বন্দে মাতরাম পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জনপ্রিয় ও উদ্দীপক স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সম্প্রদায় প্রীতি লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস হলো 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'। আনন্দমঠ উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত। এখানে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম' সংগীত পরাধীন জাতির বীজ মন্ত্র। বাংলাদেশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি। মহেন্দ্র, কল্যাণী, ভবানন্দ , সত্যানন্দ , জীবানন্দ, নিমাই প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশাত্মবোধক এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ, সমাজ , ধর্ম ও জাতীয়তা সম্পর্কে নতুন ভাবনা ও আত্মদর্শন প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দু সমাজের সামাজিক আচার আচরণ ও নানা তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসে দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রয়ী উপন্যাস। এদের রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়।

০১. আনন্দমঠ: [পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে]

০২. সীতারাম: 'সীতারাম' একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। প্রথমে এটি প্রচার পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯৩; মাঝে কয়েকমাসের বিরতি সহ) প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তা এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস।

০৩. দেবী চৌধুরাণী: উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। দেবী চৌধুরাণী প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে জানিয়েছিলেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই... দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ (অর্থাৎ আনন্দমঠের মতো) তবে, এখানে একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার স্কট বলার কারণঃ

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালাতিক্রমের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনে মোট ১৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি ইংরেজি ভাষার উপন্যাস ছিল। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের কথা। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করার ফলে ব্রিটিশদের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। ওয়াল্টার স্কটের ইংরেজি উপন্যাসের আদলকে আদর্শ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

‘বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন’

তার উপন্যাসের সব চরিত্রের সাথে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ও ঔপান্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের স্পষ্ট ছাপ থাকায় তাঁকে ‘বাংলা সাহিত্যের ওয়াল্টার স্কট’বলা হয়।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

➲ **প্রেক্ষাপট:** প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগ নেই। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিবেদন নানা রকম হতে পারে। প্রতিবেদনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (নবম-দশম শ্রেণি)। যথা : সংবাদ প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদন ও সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন।

➲ **সংবাদ প্রতিবেদন লেখার কৌশল:**

➢ **প্রথম অংশ:** দুই লাইনের মধ্যে একটি দৃষ্টিনন্দন শিরোনাম দেয়া উচিত।

➢ **দ্বিতীয় অংশ:** এরপরের অংশে বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হয়। সংবাদ প্রতিবেদন লেখার সুবিধা হলো এতে শুধু শিরোনাম লিখেই সরাসরি মূল লেখায় চলে যাওয়া যায়। এ ধরনের প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে সম্পাদকের নিকট আনুষ্ঠানিক পত্র কিংবা খাম আঁকার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নে সংবাদপত্র বা প্রতিবেদকের নাম থাকলে সেটা অনুসরণ করতে হবে। আর তা না থাকলে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

➲ **সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার কৌশল:** কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁর প্রতিষ্ঠানে জাতীয় দিবস পালন বা স্কুলের কোন সমস্যার বিবরণ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে থাকেন। এজন্য তিনি কাউকে প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।

যেমন : ধরো, তুমি 'ক' বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিজয় দিবস উপলক্ষে তোমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অনুমতি চেয়ে প্রতিবেদন রচনা কর।

➲ **শুরুটা হয় এরকম:**

*বরাবর,

প্রধান শিক্ষক,*

দিয়ে এ জাতীয় প্রতিবেদন শুরু করতে হয়। এরপর প্রসঙ্গ অনুযায়ী শিরোনাম লিখে বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। পত্র শেষে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটা খাম দেওয়া যেতে পারে। না দিলেও সমস্যা হবে না। একটি কাঠামো মেনে লিখলে পুরোটা ব্যাপার সেজে থাকবে-

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

➲ তদন্ত প্রতিবেদন লেখার কৌশল:

সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার নিয়মের সাথে তদন্ত প্রতিবেদন লেখার খানিকটা মিল রয়েছে। তবে সংবাদ প্রতিবেদনের সাথে এটা মিলবে না। এতে লেখকের ব্যক্তিগত মতামতের সম্পর্কে লিখতে হয়। দায়িত্ব প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হয়।

➲ প্রতিবেদনের শুরুতে ঘটনা ব্যাখ্যা করার পর ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে প্রতিবেদককে জানাতে হয়।

➲ মনে কর, রাস্তায় সিগন্যাল বাতি না থাকার কারণে কোন একটি স্থানে বার বার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটে থাকে। কারণ উদঘাটনের জন্য একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

➲ একটি কাঠামো লক্ষ্য করে দেখলে পুরোটা বিষয় আরো পরিষ্কার হবে।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদন

জনগণের অভাব-অভিযোগ, স্থানীয় কোনো সমস্যা, জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনেক সময় সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হতে হয়। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও যথাযথ প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হন। তাই সমস্যার আশু সমাধানের জন্যে ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতে হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে সেইসব চিঠি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়ে থাকে।

যেমন: ইত্তেফাকের 'চিঠিপত্র' প্রথম আলোর 'পাঠকের অভিমত', জনকণ্ঠের সম্পাদক সমীপে' ইত্যাদি। প্রকাশিত চিঠির বক্তব্য ও দায়দায়িত্ব লেখকের ওপর বর্তায়। সম্পাদক প্রকাশিত চিঠির কোনো দায়দায়িত্ব নেন না। এসব কলামের নিচে তাই লেখা থাকে 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়'।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আসলে দুটো চিঠি লিখতে হয়

১. সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করে পত্র, এবং

২. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

পত্রলেখক যে সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশ করতে চান, সেই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে হয়। এই চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভালো। সম্পাদককে সম্বোধন করা ছাড়াও যথাস্থানে তারিখ এবং নিচে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর দিতে হয়। অনুরোধপত্রের সঙ্গে প্রকাশিতব্য চিঠি যুক্ত করে পাঠাতে হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য চিঠিটাই মূলচিঠি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেটি তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিযুক্ত, বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। প্রাসঙ্গিক বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হয়। সমস্যা ও বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে চিঠি বড় বা ছোট হয়। চিঠির বক্তব্য যথাযথ, বিষয়ানুগ, বাহুল্যবর্জিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের চিঠিতে সাধারণত ভাবাবেগ প্রকাশের সুযোগ নেই। বক্তব্যের এবং ভাষার শুদ্ধতার প্রতি তাই বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

নমুনা

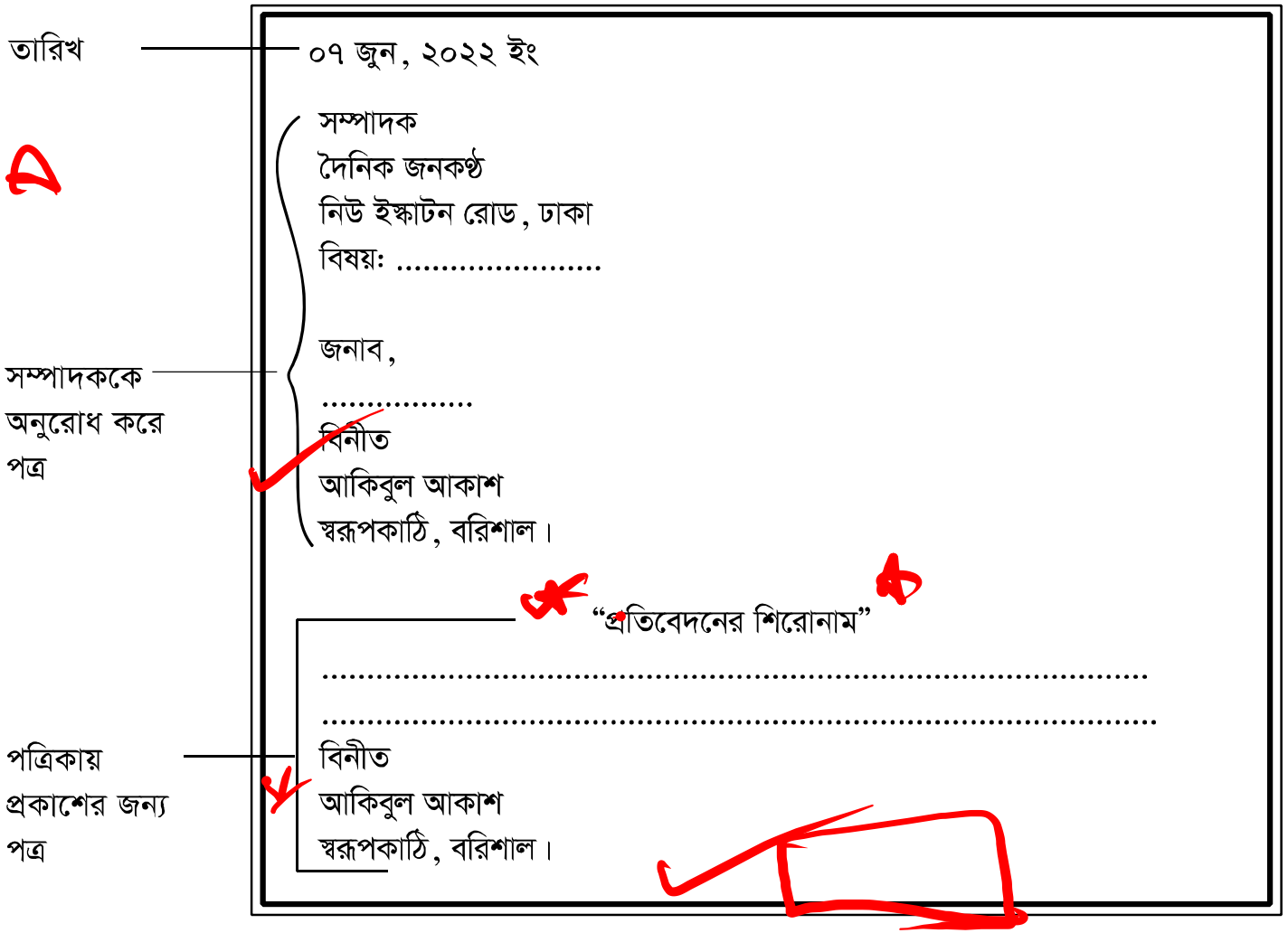

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

প্রশ্ন: বাল্যবিবাহের কুফল এবং বাল্যবিবাহ রোধে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনাসহ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন। [৪১তম বিসিএস]

৮ জুলাই, ২০২২

বরাবর

সম্পাদক

দৈনিক জনকণ্ঠ

নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

বিষয়: সংযুক্ত প্রতিবেদনটি দৈনিক সংবাদপ্রত্রের প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে আপনার বহুল প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

নিবেদক
সুমন রায় (রিক্ত)
কক্সবাজার

"বাল্যবিবাহের কুফল ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে করণীয়"

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে বাল্যবিবাহ। বর্তমানে আমাদের সমাজে যেসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে বাল্যবিবাহ তার অন্যতম। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি- এসব কারণে মেয়েদেরকে উপার্জনে অক্ষম মনে করা হয়, আর এরকম আরও অনেক কারণে মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দেশে আইন হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানাতে প্রতিনিয়ত সভা-সমাবেশ আর মানববন্ধন কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তাতে বাল্যবিবাহ থামছে না। প্রত্যন্ত গ্রাম আর শহরের বস্তিগুলোতে তো বটেই, তথাকথিত শিক্ষিত আর সচেতন সমাজেও ঘটছে বাল্যবিবাহের ঘটনা। আর বাল্যবিবাহের নানাবিধ ক্ষতিকর দিক রয়েছে যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তাই বাল্যবিবাহ যেমন একটি মেয়ের জন্য শারীরিকভাবে মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ তেমন নারী জাতির জন্য একটি অভিশাপ।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

বাল্যবিবাহ নারীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এর ফলে নারীর অগ্রযাত্রাও বাধাগ্রস্ত হয়। অল্পবয়সে বিবাহ মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। এমনকি নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কাও তৈরি করে। বাল্যবিবাহের ফলে অল্পবয়সে গর্ভবতী হওয়ার ফলে অপুষ্টিজনিত করণে অনেকসময় নবজাতক মারাও যায়। এমনকি নবজাতক বেঁচে থাকলেও পরবর্তীতে এসব শিশুরা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক জটিলতায় ভোগে। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েরা শিক্ষা দিক্ষা ও দক্ষতা, আত্ম উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে একটি শিশুর বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক মায়ের প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদানের আশঙ্কা বেশি থাকে। অল্পবয়সে বিয়ের ফলে একটি মেয়ের পক্ষে অন্য একটি পরিবারের অনেক বিষয় সামাল দেয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা অনেক শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে থাকে। অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদের মতো ঘটনাও ঘটে। ফলে পরবর্তী এসব মেয়ের বাবা-মায়ের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়, যা কোন বাবা-মা কখনো কামনা করে না। বিবাহবিচ্ছেদের ফলে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনেও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বাল্যবিবাহের ফলে একজন শিশু বঞ্চিত হয় শিক্ষা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, জীবনমানের দক্ষতা, মানসিক উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং উন্নত জীবন থেকে। সর্বোপরি বাল্যবিবাহে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষতি করার সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকেও ব্যাহত করে।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়:

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোকে বৃহৎ পরিসরে এগিয়ে আসতে হবে এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি এই সমস্যার মূলে হাত দিতে হবে। কেননা, বাবা-মায়েরা সন্তানকে বাল্যবিবাহের মতো একটি অভিশাপের দিকে কেন ঠেলে দিচ্ছেন তা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে।
- দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ নারীই বিবাহিত জীবনে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তবুও পিতা-মাতা কেন তাদের এই বাল্যবিবাহের পথ বেছে নিচ্ছেন তা অনুসন্ধান করতে হবে এবং এর মূলে কুঠার আঘাত করতে হবে।
- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও দারিদ্র্য বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের অন্যতম বড় কারণ। তাই বাল্যবিবাহকে রুখতে হলে এই সমস্যার মূলের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।
- মেয়ের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ হিসেবে বাল্যবিবাহ যে খুব একটি সুখকর সমাধান নয়, সেটি বাবা-মায়েরা ভালোভাবেই জানেন। তবে এর বিকল্প পথটির ঠিকানাও খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। তাই এই সামাজিক ব্যাধিকে রুখতে হলে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে বাল্যবিবাহের বিকল্প পথগুলো সম্পর্কে সবাইকে ধারণা দিতে হবে।

  সর্বোপরি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো মেয়েদের নিরাপদ পথচলা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, রাস্তাঘাট ও গণপরিবহনকে নারীবান্ধব ও যৌন হয়রানিমুক্ত করতে হবে। যৌতুক নিরোধ আইনে সাজার পরিমাণ বাড়িয়ে আইনকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভিন্ন স্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাটা খুব জরুরি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী নারীদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। স্বল্প শিক্ষিত ও শিক্ষা ঝরে পড়া মেয়েরা যেন বেশি করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আসতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এক কথায় নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের পথটি করতে হবে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান, যা দেখে বিয়েকেই মেয়ের জন্য একমাত্র সুরক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনার ধ্যানধারণা থেকে বাবা-মায়েরা মুক্ত হতে পারবেন।

সুমন রায় (রিক্ত)
কক্সবাজার

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

প্রশ্ন: 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্তে একটি পত্র লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]

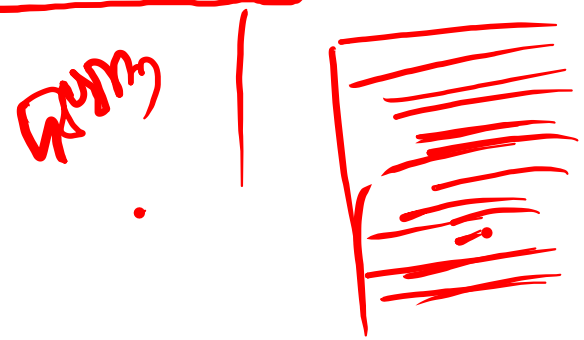

২৮ নভেম্বর, ২০২২
বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
সিএ ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয়: সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
কনক চৌধুরী
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

"জীবনের জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা"

মানুষ যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয় তবে বৃক্ষই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মৃত্তিকা থেকে প্রাণরস আহরণ করে পত্রে, পুষ্পে ও ফলে এ ধরণী ভরে তুলেছে বৃক্ষ। এ বিশ্বকে সুশীতল ও বাসযোগ্য রাখার ক্ষেত্রে তাই বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের কারণে সবুজে-শ্যামলে ভরা পৃথিবীতে নেমে এসেছে এক ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়। তাই আবহাওয়া ও জলবায়ুসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বৃক্ষ আমাদের পরম বন্ধু। বৃক্ষ শুধু প্রাকৃতিক শোভাই বাড়ায় না, মাটির ক্ষয় রোধ করে, বন্যা প্রতিরোধ করে, ঝড় তুফানকে বাধা দিয়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণেও বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবী মরুভুমিতে পরিণত হতো। বৃক্ষ অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্যতম বনজ সম্পদ। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি। আর গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বিষাক্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নেয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচুর গাছ কাটছে। বন উজার হচ্ছে। তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ বন থাকা দরকার। আমাদের দেশে তা নেই। বরং যা আছে তা-ও নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কলকারখানা। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বাড়ছে। কালকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়ায় বাতাসে বাড়ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ। ক্ষয় হচ্ছে বাতাসের ওজোন স্তর, সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। দেখা দিচ্ছে নানা রোগ ব্যাধি। এসবই ঘটছে বাতাসে অক্সিজেনের অভাবের কারণে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগালে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। তা ছাড়া আমাদের জ্বালানির চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হয় বৃক্ষের মাধ্যমে। কাঠ থেকে আমরা বাড়িঘর এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করে থাকি। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই আমাদের অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে, রাস্তার দু পাশে, পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৃক্ষ বাঁচলে আমরা বাঁচবো।

প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি

বৃক্ষহীন পরিবেশ জীবন ও জীবিকার জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই এই সম্পদের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণের জন্য লাগামহীন বৃক্ষনিধন বন্ধ করা দরকার। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ জোরদার করার প্রতি আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদে। এছাড়াও মিডিয়া এবং শিক্ষিত সমাজকে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনপূর্বক উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে। বনধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি আপন অস্তিত্বের কথা ভেবে হলেও বৃক্ষরোপণের উদ্যোগী হতে হবে।
আসুন গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই- এ স্লোগানকে যদি আমরা মিলিতভাবে গ্রহণ করি ও কাজে লাগাই, তাহলে আমাদের বৃক্ষসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ সুন্দর হবে। এটা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হবে। তাই সরকারের সাথে সাথে সকল স্তরের জনগণের মিলিত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করতে হবে।

কনক চৌধুরী
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

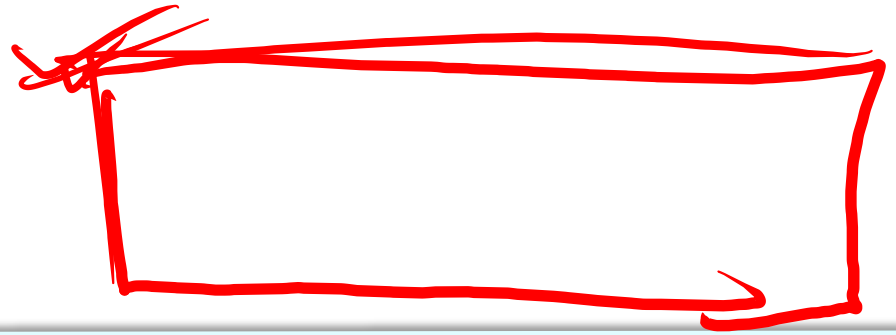

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিশেষত্ব নিরূপণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কতখানি? [৪৪তম বিসিএস]
- 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক কে এবং কেন? [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে কী বোঝেন? [৪৩তম বিসিএস]
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? এ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- 'সনেট' কী? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? কেন তাঁকে ভোরের পাখি' বলা হয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন? [৩৪তম বিসিএস

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের সর্গ সংখ্যা কত এবং কী কী? [৩২তম বিসিএস]
- ‘সধবার একাদশী’ কি সার্থক প্রহসন? আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের যে কোনো একটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৩১তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনটি অবদানের বর্ণনা দিন। [৩০তম বিসিএস]
- ‘যুগসন্ধিক্ষণের কবি’ কে? কেন বলা হয়? [৩১তম বিসিএস]
- বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান নির্দেশ করুন। [৩১তম বিসিএস]
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়? [২৯তম বিসিএস]
- সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুইয়ের মধ্যে কোনটির জন্যে বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। [২৮তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলোর একটি প্রসঙ্গ লিখুন। [২৮তম বিসিএস]
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কী এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [২৭তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy
Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়